রশীদ জামীল

জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান

জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

৩য় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৩
১ম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩২০, US $ 15. UK £ 12

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96764-8-5

Geyn Biggan Oggan
by Rashid Jamil

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

'কথাবলা'কে যে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা প্রথম আবিষ্কার করি আজ থেকে সিকি শতাব্দী আগে। আপাদমস্তক নিরীহ গোছের অতি-সাধারণ একটি কথাকেও অসাধারণভাবে উপস্থাপন করতে পারা এই মানুষটি ইদানীং বড়বেশি চুপচাপ। প্রাণচাঞ্চল্যহীন অফুরান অবসরে নীরবতাই এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। বয়োঃন্যুব্জতার অবধারিতি এভাবেই প্রভাব বিস্তার করে।

আলহাজ ডাক্তার রফিক আহমদ
আমার খালু

মিস করি আপনার গোছানো কথা বলা আর বাচনিক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। ফিরে আসুন ফেলে আসা উদ্দীপনায়। ভালো থাকুন, শতায়ু হোন।

ব্লগে তাৎক্ষণিক কথাবার্তা, কমেন্ট, প্রশ্ন, পালটা প্রশ্ন এবং সেগুলোর জবাব, একটি সরাসরি অনলাইন বিতর্ক *জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান*। এই গ্রন্থ সময় নিয়ে যাচাই-বাছাই করে তৈরি করা স্বতন্ত্র কোনো পাণ্ডুলিপি নয়। এটি বিজ্ঞান ও কুরআন নিয়ে গবেষণাধর্মী বা মৌলিক কোনো গ্রন্থও নয়। পাঠকদের কাছে অনুরোধ, গ্রন্থটি পড়ার সময় ব্যাপারটি যেন মাথায় রাখেন। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থের আবহ যেন না খোঁজেন।

প্রকাশকের কথা

ব্লগ হলো অনলাইন ডায়েরি। ব্লগ হলো লেখালিখির একটি উন্মুক্ত প্লাটফর্ম। আমি ব্লগে তেমন অ্যাকটিভ ছিলাম না, তবে ব্লগ সম্বন্ধে খোঁজখবর ভালোই রাখতাম। ব্লগে ঢু মারার জন্য ফেসবুকের মতো অ্যাকাউন্ট করা অপরিহার্য ছিল না। অফলাইনে থেকেও সব দেখা যেত। রশীদ জামীল ভাইদের দেখতাম *প্রথম আলো* ব্লগসহ অন্যান্য কমিউনিটি ব্লগে লেখালিখি করছেন। তর্কবিতর্ক করছেন বিভিন্ন বিষয়ে। কিন্তু তাঁদের সেই বিতর্ক যে মাঝেমধ্যে এতটা গভীরে চলে যেত, সেটা জানা ছিল না। কুরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে রশীদ জামীল ভাইয়ের লেখাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্কের ফসল এই গ্রন্থ—*জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান*—সেটার প্রমাণ।

এটা কোনো গবেষণাগ্রন্থ নয়; আবার এটাকে রেফারেন্সগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনারও কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু কয়েকটি মেসেজ প্রদানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করা। তার মধ্যে অন্যতম হলো, অবিশ্বাসীরা আমাদের প্রিয় ইসলাম, কুরআন আর নবি ﷺ-কে নিয়ে কী পরিমাণ পড়ালেখা করে, কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে আর কী ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশ্বাসীদের সামনে আসে, তার একটা ধারণা দেওয়া। তবে আমরা চাইলে গ্রন্থটিকে অন্যভাবে আরও গুছিয়ে, অধিক শক্তিশালী দলিল ও যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারতাম; কিন্তু এমনটা করিনি। কারণ, এতে গ্রন্থের মূল মেসেজে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়।

গ্রন্থটি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে 'কালান্তর প্রকাশনী' থেকে প্রথম প্রকাশ করেছিলাম। ছাপা শেষ হয়ে গেলেও বিশেষ কারণে আমাদের প্রকাশনীর কার্যক্রম বন্ধ থাকায় পুনর্মুদ্রণ করা হয়নি। সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে প্রকাশনীর কার্যক্রম নতুনভাবে চালু করায় গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। বিশেষ করে পাঠকমহলের তাগাদা বিবেচনায় পুনরায় প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থটিতে বানান-সংশোধনী ছাড়া কোনো ধরনের পরিবর্তন করা হয়নি; যে কারণে ভাষা বা পরিভাষাগত কথাগুলো সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে। তবু মুদ্রণজনিত কোনো ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আমাদের নজরে আনলে পরেরবার সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এখন আপনাদের হাতে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণেও কোনো সংযোজন-বিয়োজন করা হয়নি; শুধু কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে। আর হ্যাঁ, গ্রন্থটি নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো। এতে আশা করছি গ্রন্থটির সৌন্দর্য বেড়েছে; আর আপনাদেরও ভালো লাগবে। পড়তেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন ইনশাআল্লাহ।

এই সংস্করণে বানান সংশোধনের কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

লেখকের কথা

তখনো শাহবাগের জন্ম হয়নি। তখনো হেফাজত মাঠে নামেনি। বলছি ২০০৯/১০-এর কথা। বাংলা ব্লগজগৎ তখন মাঝেমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠত। কখনো রাজনীতি নিয়ে আবার কখনো ধর্মবিষয়ক কোনো লেখাকে কেন্দ্র করে। ২০০৯ সালের প্রথমদিকে ব্লগে লেখালিখি শুরু করার পর নতুন এক জগতের সন্ধান পেলাম আমি। লেখালিখির জন্য এর চেয়ে চমৎকার প্লাটফরম আর হয় না। এখানে পাঠক যারা, সবাই লেখক। ইন্সট্যান্ট রিঅ্যাকশন মিলছে। লেখার প্রতিটি লাইন ডিফেন্স করার মতো ক্ষমতা থাকা লাগছে। আবেগে বা হুজুগে কিছু একটা লিখে পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই এখানে। যেকোনো লেখকের জন্য নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার এর চেয়ে পারফেক্ট জায়গা আর হতেই পারে না।

প্রায় সব বাংলা ব্লগে ব্লগনিক থাকলেও লেখালিখিটা করতাম *প্রথম আলো* ও *আমার ব্লগ* ডটকমে। *প্রথম আলোতে* আমরা ছিলাম একটি একান্নবর্তী পরিবারের মতো। *প্রথম আলোর* ব্লগিং নিয়ে অন্য কোথাও কথা হবে। এখানে *আমার ব্লগ* ডটকম নিয়ে বলি। এই গ্রন্থটি *আমার ব্লগ* ডটকমেরই একটি সরাসরি বিতর্ক।

আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কের আনুষ্ঠানিক শুরুটাও ব্লগকেন্দ্রিক। মাঠপর্যায়ে এটার ইফেক্ট অনেক দেরিতে পড়লেও এ দ্বন্দ্ব নতুন নয়। ব্লগপাড়ায় আমরা এ নিয়ে দেনদরবার করে আসছিলাম অনেক আগে থেকেই। তারই একটি তুলনামূলক মার্জিত বিতর্ক *জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান*।

৯ ডিসেম্বর ২০১০ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০১০—লাগাতার পাঁচ দিন ধরে চলছিল ভার্চুয়াল এই যুদ্ধ। পুরো ব্লগপাড়ার চোখ ছিল এদিকে। জয়-পরাজয়ের ব্যাপার ছিল না; কিন্তু অবচেতনিক একধরনের প্রতিযোগিতা ছিল।

কালান্তর প্রকাশনীকে ধন্যবাদ গ্রন্থ আকারে প্রকাশের জন্যে আগ্রহী হওয়ায়। ধন্যবাদ কালান্তরের কর্ণধার আবুল কালাম আজাদকে; গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, সম্পাদনা এবং গেটাপ-সেটাপের কাজটি আন্তরিকভাবে করবার জন্য।

রশীদ জামীল
rjsylbd@yahoo.co.uk

জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান

'সব সমস্যার সমাধান, দিতে পারে আল কুরআন' এটি একটি চমৎকার স্লোগান। পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান একমাত্র কুরআনই দিতে পারে। তবে পাশাপাশি আরও একটি স্লোগান তৈরি করা দরকার ছিল, যার মূল বক্তব্য হবে—সব সম্ভাবনার দ্বারও এই কুরআন খুলে দেয়। কুরআন যেমন সমস্যার সমাধান দেয়, তেমনি সম্ভাবনার সন্ধানও দেয়।

'কী আছে কুরআনে?' এটি একটি অপরিপক্ক প্রশ্ন। প্রশ্নটি যদি হয় 'কী নেই কুরআনে', তাহলে হয়তো প্রশ্ন কিছুটা জুতসই হয়। একটা গল্প বলি।

এক লোক বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তার উড়নচণ্ডী স্বভাবের স্ত্রী আবেগে গদগদ হয়ে বলল : ওগো, মার্কেট থেকে আমার জন্য কী আনবে?

স্বামী বলল, আনব কিছু একটা।

—বলো না, সেটা কী?

—কী চাও তুমি?

স্ত্রী তখন রসিকতা করে বলল, চাই তো অনেক কিছুই। সম্ভব হলে তো বলতাম, পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে এসো; কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না।

স্বামী বেচারা তখন বউয়ের লেলিয়ে লেলিয়ে কথায় নেতিয়ে পড়েছে! বলল, আচ্ছা যাও, আজ আমি তোমার জন্য পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ে আসব।

হেসে উঠল স্ত্রী। তুমি তো দেখছি পাগল হয়ে গেছ! পৃথিবীর সবকিছু তুমি আমার জন্য নিয়ে আসবে কীভাবে? তোমার সেই ক্ষমতা আছে নাকি!

অশিক্ষিত গ্রাম্য হলেও স্বামী বেচারা পুরুষ তো! তাই স্ত্রীর কথায় তার পৌরুষে গিয়ে আঘাত লাগল। কিছু সময়ের জন্য হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে বলে বসল, আজ আমি অবশ্যই তোমার জন্য পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে আসব। যদি না পারি, তাহলে তুমি তালাক হয়ে যাবে। এ কথা বলেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘণ্টাদুয়েক পর। ততক্ষণে মাথা থেকে

আবেগের ভূত নেমেছে, পড়ল মহা দুর্ভাবনায়। পৃথিবীর সবকিছু তো সে জীবনেও কিনে আনতে পারবে না। আবার বউকে শর্তসাপেক্ষে তালাকও বলে এসেছে; এখন উপায়?

বেশকিছু আলিমের সাথে দেখা করল সে। সমস্যার সমাধান চাইল। সকল আলিমই তাকে জানালেন, পৃথিবীর সবকিছু বউকে দিয়ে দেওয়া যেহেতু কখনো সম্ভব না, তাই বউকে আর ধরে রাখার কোনো উপায় নেই। লোকটি মাথার চুল টানতে টানতে দিশেহারার মতো ঘুরতে লাগল।

এক লোক তার কাহিনি শুনে বলল, তুমি একজনের কাছে যেতে পারো। শুনেছি তিনি মস্ত বড় আলিম। কিছু হলেও হতে পারে। লোকটি চলে গেল ওই আলিমের কাছে। বিস্তারিত শোনার পর আলিম বললেন, এত বড় কথা বলার কী দরকার ছিল?

সে বলল, ভুল হয়ে গেছে হুজুর। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। রাগের মাথায় কী থেকে কী বলে ফেলেছি, বুঝতেই পারিনি। আর কখনো এমন হবে না। আপনি আমাকে এবারের মতো বাঁচিয়ে দিন। আমি আল্লাহকে ভয় করি, আবার স্ত্রীকেও ছাড়তে চাই না। আমি আমার স্ত্রীকে বড় বেশি ভালোবাসি ।

ওই আলিমের চেহারায় তখন হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, আর কখনো এমন হবে না তো? লোকটি বলল, জি না হুজুর। জীবনে এমন কথা আর ভুলেও উচ্চারণ করব না। তিনি বললেন, মনে থাকে যেন। এখন যাও, কোনো লাইব্রেরি থেকে একখানা কুরআন শরিফ নিয়ে তোমার স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দাও। তাহলে তোমার স্ত্রীর আর তালাক হবে না।

এত বড় জটিল সমস্যার এই সহজ সমাধান পেয়ে লোকটি অবিশ্বাস্য চোখে তাকাতে লাগল আলিমের দিকে। ব্যাপারটি লক্ষ করে তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিন্তে এটা করতে পারো। আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি। তুমি তোমার স্ত্রীকে তো এটাই বলেছিলে, পৃথিবীর সবকিছু এনে তাকে দিতে না পারলে তার তালাক হয়ে যাবে? পবিত্র কুরআন হচ্ছে এমন এক কিতাব, যার মধ্যে পৃথিবীর সবকিছুই আছে।

লোকটি বিড়ম্বনার হাত থেকে বেঁচে গেল। যে বিখ্যাত আলিম লোকটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম নুমান ইবনু সাবিত রাহ.। বিশ্বমুসলিমের কাছে যিনি ইমাম আবু হানিফা নামে পরিচিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীর সবকিছুই কুরআনে আছে, কথাটি কি আবেগতাড়িত কিংবা হুজুগে? প্রযুক্তির এই যুগে আবেগ বা হুজুগের তো স্থান নেই। বাস্তবতার মানদণ্ডে যুক্তির নিরিখেই সবকিছু বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমানবিশ্বে উন্নতি ও অগ্রগতির পরিমাপক মনে করা হয় বিজ্ঞানকে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ফায়সালা কী?

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি কথা বলে রাখি। কুরআনকে বলা হয়েছে 'হাকিম'। হাকিম মানে বিজ্ঞানময়। বর্তমানবিশ্বের বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলা যায়, প্রযুক্তির শেষ নির্যাসটুকু ব্যবহার করেও কুরআনের কোনো একটি বাক্য বা শব্দকে অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করা যাবে না।

বলা হবে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের থিওরির সাথে কুরআনের বক্তব্যের মিল নেই কেন? অথবা কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের অনেক সূত্রের অমিল কেন?

এ ক্ষেত্রে সরল বক্তব্য হচ্ছে, বর্তমান যুগে আধুনিকতাবাদী ও প্রযুক্তির স্লোগানধারীদের মধ্যে যারা মুসলমান, কুরআন ও আল্লাহতে বিশ্বাসী, তাদের কথা বলছি—তারাও তাদের মানসিকতায় একটি মূলনীতি সেট করে রেখেছেন এভাবে—কুরআনের সূত্রগুলো যদি বিজ্ঞানের থিওরির সাথে মেলে, তাহলে সেগুলো গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ওপরই আমল করা হবে। অথচ একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর মনোভাব এমন হওয়া উচিত ছিল—বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো কুরআনের বিরুদ্ধে যাবে না, কেবল সেগুলোই গ্রহণ করা হবে। এর পক্ষে লজিস্টিক সাপোর্টও আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যত অর্জন, সবগুলোই মানুষ আবিষ্কার করেছে তার মেধা ও ব্রেইন খাটিয়ে। আর এই ব্রেইন তৈরি করেছেন আল্লাহপাক, পরিমিত ও সীমিত ক্ষমতা দিয়ে। তাহলে যুক্তি কী বলে? কার ক্ষমতা বেশি? সৃষ্টির নাকি স্রষ্টার?

দ্বিতীয় কথা, বিজ্ঞান ও কুরআনের মধ্যে মতের অমিল দেখা দিলে কুরআনের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মেনে নিতে হবে। কারণ, দেড় হাজার বছর আগে থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কুরআন তার সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন আনেনি। পক্ষান্তরে সময়ের সাথে সাথে একই বিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। ভূরিভূরি উদাহরণ দেওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর চেষ্টা-তদবির করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। দেখা গেছে, কিছুদিন পর তারা ফিরে এসেছেন তাদের সিদ্ধান্ত থেকে। একটি উদাহরণ দিই,

একসময় বিজ্ঞানীরা আমাদের জানিয়েছেন, পৃথিবী স্থির। চন্দ্র-সূর্য ঘুরছে। বিজ্ঞানী পিথাগোরাস, টলেমি ও টাইকো ব্রাহের মতো বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা এই মত দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কেপলার ও কোপার্নিকাসের মতো বিজ্ঞানীরা এসে ফাতওয়া দিলেন, আগের ধারণাটি সঠিক ছিল না। সূর্য নয় বরং পৃথিবী ঘুরছে। আবার বর্তমানবিশ্বের প্রায় সকল বিজ্ঞানীই ঐকমত্য পোষণ করে ফাতওয়া দিচ্ছেন, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী সবই ঘুরছে। অনেক ঘোরাঘুরি করে এবারে তারা লাইনে এসেছেন। কারণ, ১৪ শত বছর আগে ঠিক এ কথাটিই কুরআন বলে রেখেছে। সুরা ইয়াসিনের ৪০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে,

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

(চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী) আর সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, বিজ্ঞান ও কুরআনের মধ্যকার সম্পর্ক কখনো হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ, কখনো হয় সাংঘর্ষিক। আর এটা নির্ভর করে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের ধরনের ওপর। এমন নয় যে, বিজ্ঞানীরা সব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা ভুলও করেন। বিজ্ঞানীদের যে সিদ্ধান্তগুলো শুদ্ধ হয়, সেগুলো যে কুরআনের সাথে কেবল সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নয়; বরং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজলে দেখা যাবে, ঢাকঢোল পিটিয়ে যে ব্যাপারগুলো আবিষ্কারের কৃতিত্বে বগল বাজাচ্ছেন তারা, সেটা যদি হয় ভালো কিছু, তাহলে দেড় হাজার বছর আগে পবিত্র কুরআনে সেটা বিবৃত হয়ে আছে। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের সঠিক থিওরিগুলো যে কুরআন থেকেই আহরিত, এ কথা আর না বললেও চলে।

পৃথিবীর মানুষ অনেক চেষ্টা-তদবির করে যে বিষয়গুলো আবিষ্কার করেছে, সেগুলো আবিষ্কারের পেছনে মূল সূত্র হিসেবে কাজ করেছে পবিত্র কুরআন। তারা স্বীকার করুক আর না-ই করুক, এটাই বাস্তবতা। এ নিয়ে অনেক বই-পুস্তক রচিত হয়েছে। মহাবিশ্বে এমন কিছু নেই, যার বর্ণনা বা ইঙ্গিত কুরআনে দেওয়া হয়নি। আমরা যদি খুঁজে না পাই, সেটা আমাদের অজ্ঞতা। পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য, মানবসৃষ্টির কলাকৌশল, জিনতত্ত্ব, মধ্যাকর্ষণ, মহাশূন্যযান, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ডিএনএ...কী নেই কুরআনে! আমরা অজ্ঞ ও অন্ধ মুসলিমরা সেগুলো কুরআনে খুঁজে না দেখে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি। আর অমুসলিম বিজ্ঞানীরা যখন একটা একটা করে আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়, তখন আমরা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি!

বিজ্ঞানের মূল উপাদান মনে করা হয় গণিতকে। গণিত না বুঝলে কারও পক্ষে বিজ্ঞান বোঝা সম্ভব নয়। যেহেতু কুরআনকে বলা হয়েছে হাকিম বা বিজ্ঞানময়, সুতরাং গণিতের মৌলিক কথাগুলো যদি কুরআনে না থাকে, তাহলে তো হবে না। চলুন উদাহরণ হিসেবে বিসমিল্লাহকেই সামনে নিয়ে আসি।

আরবি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বাক্যে ১৯টি অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। এই ১৯ সংখ্যাটিকে সূত্র ধরে হিসাব করলে দেখা যায় কুরআন কত বেশি পরিকল্পিত। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমে শব্দ রয়েছে ৪টি : ইসিম, আল্লাহ, রাহমান ও রাহিম।

পুরো কুরআনে 'ইসিম' শব্দ এসেছে ১৯ বার। এই ১৯ বিসমিল্লাহর ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। আল্লাহ শব্দ আছে ২৬৮৯ বার, রাহমান ৫৭ বার এবং রাহিম ১১৪ বার। প্রত্যেকটি ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

স্মরণ রাখার মতো একটি তথ্য হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম একটিই—আল্লাহ। গুণবাচক নাম রয়েছে অসংখ্য। যদিও খোলাবাজারে প্রচলিত একটি কথা হলো, আল্লাহর নাম ৯৯টি। কথাটি সর্বাংশে সঠিক নয়। কুরআনেই আল্লাহর ১১৪টি নাম রয়েছে। আর অনুসন্ধিৎসু হাদিসবিশারদগণ বিশ্বনবি ﷺ-এর হাদিস ঘাঁটাঘাঁটি করে আল্লাহর ১০ হাজারেরও বেশি গুণবাচক নামের সন্ধান পেয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। তো পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নাম ১১৪টি, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

কমপিউটার আমাদের বিসমিল্লাহর ১৯-সংক্রান্ত আরও যে সকল তথ্য দিয়েছে, তাতে আমি মোটামুটি নিশ্চিত, কমপিউটারের যদি জীবন থাকত আর তাকেও আমাদের মতো কিয়ামতের মাঠে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ব্যাপার থাকত, তাহলে তার সকল অপব্যবহার ও নষ্টামির সফটওয়্যারের সুযোগ করে দেওয়ার পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিতেন এই বিসমিল্লাহ-সংক্রান্ত সুন্দর সুন্দর তথ্য বের করে দেওয়ার কারণে। বিসমিল্লাহ-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এখানে একটিমাত্র তথ্য তুলে ধরছি।

পবিত্র কুরআনের প্রথমেই রয়েছে আলিফ-লাম-মিম। এগুলোকে বলা হয় হরফে মুকাত্তাআত। কুরআনের ২৯টি সুরার প্রথমে হরফে মুকাত্তাআতের ১৪টি বর্ণ ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ২৯+১৪+১৪=৫৭—বিসমিল্লাহর ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। আবার এই আলিফ-লাম-মিম মোট ৬টি সুরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, প্রতিটি সুরায় এই অক্ষরগুলো যতবার ব্যবহৃত হয়েছে, তার সমষ্টিও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। যেমন :

সুরা	আলিফ	লাম	মিম	সমষ্টি	১৯ দিয়ে বিভাজ্য
বাকারা	৪৫০২	৩২০২	২১৯৫	৯৮৯৯	” ” ”
আলে ইমরান	২৫২১	১৮৯২	১২৪৯	৫৬৬২	” ” ”
আনকাবুত	৭৭৪	৫৫৪	৩৪৪	১৬৭২	” ” ”
রুম	৫৪৪	৩৯৩	৩১৭	১২৫৪	” ” ”
লুকমান	৩৪৭	২৯৭	১৭৩	৮১৭	” ” ”
সিজদাহ	২৫৭	১৫৫	১৫৮	৫৭০	” ” ”
মোট	৮৯৪৫	৬৪৯৩	৪৪৩৬	১৯৮৭৪	” ” ”

পবিত্র কুরআনের নিপুণ কারিগর আল্লাহ তাআলার নিখুঁত এবং বিস্ময়কর উপস্থাপনা দেখুন। আলিফ-লাম-মিমের প্রত্যেকটির সমষ্টি ৮৯৪৫, ৬৪৯৩, ৪৪৩৬ যোগ করলে যোগফল হয় ১৯৮৭৪। সেটাও ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। এটা কাকতালীয় নয়। এত নিখুঁত

মিলকে কাকতালীয় বলার সুযোগ নেই। এটা মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর মহান নিদর্শন।

পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে যারা বলেন, There is no god, সেই মহা জ্ঞানীদের বলি, শুধু বিসমিল্লাহর মহাগাণিতিক অত্যাশ্চর্যে একবার চোখ বুলান। আপনার বিবেক যদি আপনার সঙ্গ ত্যাগ না করে, তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, বিজ্ঞানের মূল উপাদান গণিতের আসল ফরমুলাগুলো কুরআনেই আছে।[১]

[১] বিসমিল্লাহ-সংক্রান্ত এই গাণিতিক ফরমুলা একজন ব্যক্তির গবেষণা। অনেকে এটাকে আগ্রহের সঙ্গে সবিস্ময়ে গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ আবার এই ফরমুলাকে গলদ বলেছেন। সমস্যা নেই। এটা আকায়িদ-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার নয় যে, সহিহ-গলদ নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামানোর দরকার আছে।—লেখক।

পৃথিবীর জন্মদিন

সৃষ্টির আগে পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল? পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? সৃষ্টিপ্রণালি কেমন ছিল, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এখনো হচ্ছে। আলিমদের কাছে পৃথিবীর সৃষ্টিপ্রণালি নিয়ে প্রশ্ন করলে দুটি জবাব পাওয়া যায় :

১. কুন ফায়াকুন অর্থাৎ, কোনোকিছু সৃষ্টির ইচ্ছা হলে আল্লাহপাক শুধু বলেন, 'হও', এমনিতেই হয়ে যায়।

২. ছয় দিনে। জমিন-আসমান সৃষ্টিতে আল্লাহপাক ছয় দিন লাগিয়েছেন। কোনো বস্তু তৈরিতে আল্লাহর উপকরণ বা সময়ের দরকার হয় না। তবু ছয় দিন লাগিয়ে পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আমাদের শিক্ষা দেওয়া যে, কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করো না। এই আমাকে দেখো, ক্ষমতা ছিল আমার। চাইলে এক মাইক্রো সেকেন্ডেরও কম সময়ে পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারতাম; তবু আমি ছয় দিন লাগিয়েছি।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিপ্রণালির বিষয়টি ক্লিয়ার হয়নি। আল্লাহপাক নিজ কুদরতে এবং ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন—ঠিক আছে। কিন্তু সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা কী ছিল, সেটা জানা যায়নি। তাফসিরকারকরা এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে রাজি নন। বিষয়টি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন বিজ্ঞানীরা। শত শত বছর গবেষণা করে একসময় পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হলেন তারা। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী G Lemaiter প্রথম Big bang বা মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্বের প্রস্তাব করলেন। এরপর আরও ৩৮ বছর চলল চুলচেরা গবেষণা। অবশেষে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এসে বিজ্ঞানী উইলসন ও পেনজিয়াস প্রমাণ করলেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির মৌলিক তত্ত্ব হচ্ছে বিগ ব্যাং। আর যুগান্তকারী এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসেবে উইলসন ও পেনজিয়াস নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

বিগ ব্যাং হচ্ছে এমন এক ঘটনা, যার আগে নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অর্থাৎ, বর্তমান মহাবিশ্বের পদার্থ, শক্তি, স্থান-কাল একটি বস্তুপিণ্ডে কেন্দ্রীভূত ছিল। যে বস্তুপিণ্ডে ছিল অসীম ঘনত্ব ও অগাধ উষ্ণতা।

একসময় বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। অস্তিত্বে আসে পৃথিবী। স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত হয় চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র।

উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্ব মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রদত্ত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে একটি বিশেষ মুহূর্তে মহাবিশ্বের উদ্ভব। এই তত্ত্ব বলে আজ থেকে প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে এই মহাবিশ্ব একটি অতি ঘন এবং উত্তপ্ত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

আলিম চিন্তাবিদরা বিগ ব্যাং থিওরির সাথে একমত হতে চান না। আবার আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টিরহস্যের বিকল্প কোনো ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেন না। অথচ যে বিগ ব্যাং থিওরিকে আলিমসমাজ গ্রহণ করতে রাজি নন, যে তত্ত্বটি আবিষ্কারের কৃতিত্বে বিজ্ঞানীরা আত্মহারা, আমরা সেটা খুঁজে না পেলেও দেড় হাজার বছর আগেই কিন্তু আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তত্ত্বের সূত্রটি উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ করে দেখে না, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল (একটি বস্তুর মতো) পরস্পর সংযুক্ত ছিল। তারপর আমি এদের ভেঙে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। [সূরা আম্বিয়া : ৩০]

আরবি 'রাত্ক' শব্দের অর্থ পদার্থ, শক্তি ও স্থান-কালের একটি সংযুক্ত প্রক্রিয়া। আর 'ফাত্ক' মানে কোনো সংযুক্ত বস্তুকে পৃথক করা, ভেঙে আলাদা করা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি। সহজ মানে হলো পৃথিবী সৃষ্টির বহুল আলোচিত মহাবিস্ফোরণ-তত্ত্বটি পবিত্র কুরআনে বহু আগেই বিবৃত হয়ে আছে। এখন আমরা যদি সেটা খুঁজে বের করতে না পারি, তাহলে এই ব্যর্থতা কার?

আবার পৃথিবী যে আল্লাহপাক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছেন, কুরআনে তার আরও প্রমাণ আছে। কিয়ামতের আগে ইসরাফিল আ. শিঙায় ফুঁ দেওয়ার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং মানুষকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে, সেদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনের সূরা ইয়াসিনের ৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾

এটা হবে এক মহাবিস্ফোরণ, আর তাদের সবাইকে আমার সামনে এনে হাজির করা হবে।

আরবি صيحة (সুয়াইহা) অর্থ Big blast; বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম Big bang।

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, বিগ ক্রাস্ট বা বিগ ব্যাং সংঘটিত হবে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির সময়। আবার সুরা আম্বিয়ার ১০৪ নং আয়াতে আল্লাহপাক ঘোষণা দিয়েছেন,

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾

প্রথমবার সৃষ্টির সময় যেভাবে শুরু করেছিলাম, পুনরায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

যেহেতু দ্বিতীয়বার সৃষ্টির সময় মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমেই সেটা করা হবে, তার মানে প্রথমবার একইভাবে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমেই করা হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবী কত সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে?

এ ব্যাপারে কয়েকটি তথ্য সামনে রাখা যায়। সুরা ইয়াসিনের ৮২ নম্বর আয়াতে রয়েছে,

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾

প্রকৃতপক্ষে কোনোকিছু সৃষ্টির জন্য আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন—'হও', ব্যস, হয়ে যায়।

এই সূত্র সামনে রাখলে পৃথিবীর সৃষ্টিতে এক সেকেন্ড সময়ও লাগার কথা নয়। আবার সুরা সিজদার ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর অন্তর্বর্তী সবকিছুকে আল্লাহ তাআলা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

অন্যদিকে সুরা হা-মিমের ১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾

অতএব, দুই দিনে সাত আসমানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

এখানে একটি তথ্য জানিয়ে রাখি, পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াতে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, সেখানে দিন বলতে আমাদের পৃথিবীর দিন বোঝানো হয়নি। এই দিন মানে একটি সময়। যেমন :

﴿إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾

প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রভুর দরবারে একদিন তোমাদের হিসাবে ১ হাজার বছরের সমান। [সুরা হজ : ৪৭]